PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা
Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা
MONTHLY
মাসিক
Vol : X Issue : VIII, 15th, November, 2021 অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

## সম্পাদকীয়

সবাইকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই। দীপাবলি প্রকৃতপক্ষে আলোর উৎসব।

"ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও
আলোয় ধরিত্রীরে।"

কিন্তু, আমরা একে আতসবাজির উৎসবে পরিণত করেছি। চিকিৎসক, পরিবেশ-বিজ্ঞানী— সবার নিষেধ অমান্য করে মরনোন্মুখ পতঙ্গের মতো বাজির দিকে ছুটে চলেছি। এখন আবার, 'সবুজ বাজি' নিয়ে মেতে উঠব, সেটা আদতে এক সোনার পাথরবাটি।

জীবনযাত্রা ক্রমশই স্বাভাবিক হচ্ছে। স্কুল-কলেজ, লোকাল ট্রেন, সিনেমাহল— সবই খুলে গেছে বা খুলবে। চিকিৎসকরা, কিন্তু বারংবার করোনার তৃতীয় ঢেউ-এর সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। অতএব সাবধানে থাকুন, নিময়কানুন মেনে চলুন।

## ভ্রম

অমল কর

ভ্রান্তির মরীচিকা হাতছানি দিলে
মায়াবী মারীচ ভোলায় পথের দিশা
বাঁশি ভেঙে গেলে বোলহীন ঘুঙুর
ভুল তানকারিতে হাহাকার করে
ভিত্তির ভিত টালমাটাল হলে
ক্রমাগত রং বদলায় সুবিধেখোর গিরিগিটিরা
তোয়াজ-দাসত্বের জীবিকা পেলে
সব ছেড়ে বেইমানির পতাকা ধরে
শেকল পরে বন্দি পাখি বন্দনা গায় খাঁচার
স্বপ্ন-বেচা মানুষেরা ম্যানিকুইনের পায় আবির মাখায়

বিষ-গিঁটে বাঁধা ছলিত সময়ের গ্রন্থিতে
বিসমিল্লায় গলদ-ভরা জীবন নিয়ে
বোড়ে সামাল দিতে না-পারলে
ভুল চালে নিশ্চিত কিস্তিমাত

ইষ্টানিষ্ট বুঝে সব ভুল ভেঙে সুপথের শপথে
শতহাতে বইঠা মেরে জল ভাঙব আর কবে!

Vol : X Issue : VIII, 15th November, 2021, PRABINBARTA (RNI NO - WBBEN/2012/46375)

# আ মরি! বাংলা ভাষা

মণীন্দ্রনাথ আশ

ভোলা যায় না দেশভাগের যন্ত্রণা।
তবুও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলি—
"আমরা যেন চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে থাকুক গে পাহারা।"

বাংলা ভাষা হচ্ছে লালনের ভাষা, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের ভাষা, হাসান রাজা ও আব্বাস উদ্দিনের ভাষা।

পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অবিভক্ত ভারতে সর্বসাধারণের ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীতে।

ভারত প্রেমিক উইলয়ম কেরি ছিলেন বহুভাষাবিদ, তিনি মনে করতেন ভারতের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রাঞ্জল ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা। তবুও এর বিরোধিতাতেই একদিন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, শুধু একটি নয়, একাধিক।

প্রথম স্বদেশিকতার গান শুনিয়ে ছিলেন— রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) (১৭৪১-১৮৩৯)—

"নানান দেশের নানান ভাষা
বিণে স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর কি বা ফল চাতকীর
ধারা জল বিণে কভু
ঘুচে কি তৃষা?"

এই বীজমন্ত্রের অনুসারি— "মোদের গরব মোদের আশা/আ মরি! বাংলা ভাষা।" অতুল প্রসাদ সেনের কণ্ঠে শোনা গেল— "কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে মাঝি দাঁড় টানে।

তবুও বার বার বাংলা ভাষাকে রোষানলে পড়তে হয়েছে। পড়তে হয়েছে হিন্দি আগ্রাসনের কবলে।

সেই ১৯৩১ সালের কথা। মানভূম জেলার সদর মহকুমা পুরুলিয়ায় শতকরা ৮৭ ভাগ বাংলা ভাষাভাষি মানুষের বসবাস। তৎকালীন বিহার সরকার নিয়ন্ত্রিত পক্ষপাতিত্বই পরে দমন-পীড়নে পরিণত হয়। আকস্মিক ভাবে ১৯৪৮ সালে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মানভূম জেলার কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা

হরফে কোনও সাইন বোর্ড দেওয়া যাবে না। এমনকি বাংলা স্কুলে বাংলা ভাষায় প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া নিষিদ্ধ। তার পরিবর্তে "রামধুন" সঙ্গীত আবশ্যিক করা হয়েছিল। এমনকি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল শুধুমাত্র হিন্দি ভাষাতেই চলবে, চালাতে হবে। এই হঠকারি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল হল মানভূম-পুরুলিয়ার মানুষ। শুরু হল মুক্তির লড়াই। অতুলচন্দ্র ঘোষ, নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত, লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে তীব্র হল গণআন্দোলন। এর ফলেই পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হল। এই আন্দোলনে লোকায়ত "টুসু" গান এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল।

তারপর গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। রাষ্ট্রভাষা চাই ভাংলো ভাষা, এই দাবিতে উত্তাল হল পূর্ব পাকিস্তান। শেখ মুজিবর রহমনের উদাত্ত আহ্বানে যুব-ছাত্ররা হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে লড়াই করলেন, শহীদ হয়েছিলেন সহস্রাধিক মানুষ। এই যুদ্ধে ভারত সরকার শুধুমাত্র নীরব দর্শক ছিলেন না, আর এপার বাংলার মানুষ-এর ভূমিকা ছিল কাঠবিড়ালীর মতো, বেতার তরঙ্গে ভাষণে সদা সর্বদা উজ্জীবিত করে গেছে মানুষকে। শহীদ স্মরণে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আমরা শুনলাম— "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। আমি কি ভুলিতে পারি।" আমরা ভুলিনি। ভোলেনি এপারের ভূমিপুত্র কোন্নগর ও মুর্শিদাবাদ। কোন্নগরের শফিউর রহমন ও মুর্শিদাবাদের আবুল বরকত এরা দুজনেই এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালির আপন দেশ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা ভাষা পাকাপাকি ভাবে সম্মান পেল, যখন ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে।

তবে মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে আরও ৬টি ভাষার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস আছে—

(১) ২০ মার্চ— আন্তর্জাতিক ফরাসি ভাষা দিবস।

(২) ২০ এপ্রিল— আন্তর্জাতিক চিনা ভাষা দিবস— (চিনা বর্ণমালার প্রতিষ্ঠাতা "সঙজি হৈ"-কে স্মরণ করে।

(৩) ২৩ এপ্রিল— আন্তর্জাতিক "ইংরেজি ভাষা দিবস"— (শেক্সপিয়রের মৃত্যু বার্ষিকি) স্মরণে।

(৪) ৬ জুন— আন্তর্জাতিক রুশ ভাষা দিবস— (আলেকজান্ডার পুশকিনের) জন্মবার্ষিকি স্মরণে।

(৫) ২১ অক্টোবর— আন্তর্জাতিক "স্প্যানিশ ভাষা দিবস"।

(৬) ১৮ ডিসেম্বর— আন্তর্জাতিক "আরবি ভাষা দিবস"।

প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় সাহেবদের ঠিক করা দিনে। ইংরেজি + বাংলা মিশিয়ে কেন? আমরা কি দিনটিকে বাংলায় ৮ ফাল্গুন বলতে পারি না। যেমন বাংলায় আছে— ২৫ বৈশাখ বা ১ বৈশাখ।

১৯৬১ সালে "রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে" বাংলা ভাষার মর্যাদা ও স্বাধিকার রক্ষার দাবি জানাবার "অপরাধে" শিলচর রেলস্টেশনের কাছে অসমের রাইফেল বাহিনী এক তরুণীসহ ১১ জনকে হত্যা করে। কি করে ঘটল এসব গণহত্যা? ২১ ফেব্রুয়ারির ৯ বছর পরেও। যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন— চণ্ডীচরণ সূত্রধর, তরুণী দেবনাথ, কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, শচীন্দ্র নাথ পাল, কমলা ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন দেব, সুকোমল পুরকায়স্থ।

এক সংবাদ পত্রের সমীক্ষায় জানা যায়, খোদ বিলাতে ৮০ ভাগ মানুষ ইংরেজিতে কথা বলেন। তারপর নাকি— বাংলা ভাষায় পরে ফরাসী - জার্মানী ইত্যাদি।

সেই অন্ধ বাউলকে মনে পড়ে, যে নাকি বাংলা শুনলে, আনন্দে আত্মহরা হয়ে যেতেন— "বাংলা ভাষা উচ্চরিতলে, সেই অন্ধ বাউল নেচে ওঠে।" পরিশেষে লোকসঙ্গীত শিল্পী অমর পালের কণ্ঠে গাওয়া গান— "ও মোর ভাষা রে তোর ভাষাতে কথা বলি শ্যামল মাটির বুকে, তোর সুরেতে গান ধরেছি কতই না সুখেরে। বাংলা মোর নয়ণমনি, বাংলা আমরা জন্মভূমি, বাংলা আমার আশারে।"

আগামি ৪ ডিসেম্বর ২০২১, শনিবার আমাদের বাৎসরিক সাধারণ সভা (A.G.M)।
স্থান ঃ শহীদ স্মৃতি ভবন, বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহ।
সময় ঃ বিকাল ৪ টা।
প্রত্যেকের উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ কাম্য।

# স্মৃতিতে উজ্জ্বল তাঁরা—জলন্ত, অমর

(২য় পর্ব)

পেলব মুখার্জী

১৯৬৩ সালের জয়ার ঐতিহসিক ধর্মঘট হয়েছিল। ধর্মঘট ভাঙ্গতে কোম্পানী ২৫ জনকে ছাঁটাই করে। আমরা ট্রাইবুনালে মামলা চালিয়ে ছিলাম। মাত্র ৩ জনকে ট্রাইবুনাল চাকুরি দেওয়ার কথা বলেন। বাকীরা ছাটাই। যে অত্যাচার শ্রমিকদের উপরে হয়েছিল সে কথা বলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। ধর্মঘটের অবসানের পরে ইউনিয়নের নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের প্রথমদিকের একটা ভারতবন্‌ধ-কে কেন্দ্র করে আমাদের ইউনিয়নের মধ্যে একটা আলোড়ন তৈরি হয়। কোম্পানী তার সর্বশক্তি দিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে। তারা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে সবরকমের সাহায্য করে যাতে ধর্মঘট বানচাল করা যায়। হিন্দুস্থানী/বাঙ্গালী, ঘটি/বাঙ্গাল এইসব কথা বলে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। সেই সময়ে শাসক গোষ্ঠীর ইউনিয়নের অবাঙ্গালী শ্রমিক নেতাদের মধ্যে একটা অংশকে তারা কাজে লাগায় এবং আংশিকভাবে হলেও একটা ভাল অংশের শ্রমিককে তারা ভারতবন্‌ধের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। সেইসময় চাপে পড়ে এবং বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের অন্যতম রামায়ণ পান্ডে ধর্মঘট ভেঙ্গে কাজে চলে আসেন। স্বভাবতই শ্রমিকদের মধ্যে নানারকমের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার হওয়াতে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। পান্ডে ধর্মঘটের পরে সেটা বুঝতে পারে এবং সে ধর্মঘটের পরে আমাদের জানায় নানা চাপে বাধ্য হয়ে ভারতবন্‌ধ-এর বিরোধিতা তাকে করতে হয়েছে। সে অনুতপ্ত এবং চেষ্টা করলে এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য সে নেতৃত্ব থেকে সরে থাকতে চায় এবং আগামী ১ বছরের মধ্যে সংগঠনের যে ক্ষতি হয়েছে তা নিশ্চয়ই পূরণ করবে। ১ বছরের মধ্যে অবাঙ্গালী শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনকে তিনি ভারতবন্‌ধ-এর যৌক্তিকতা বোঝাতে পেরেছিলেন। শ্রী জয়কৃষ্ণ তেওয়ারী, প্রতাপ শাহী, লালজী গিরিসহ একটা বিরাট অংশের শ্রমিক নেতৃত্ব গড়ে উঠে এবং কোম্পানীর অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ইউনিয়নের মধ্যে ঐক্য রক্ষা ও তাকে প্রসারিত করার কাজে রামায়ণ পান্ডের এই ভূমিকা এক জ্বলন্ত নজির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

এখন পর্যন্ত যা বলেছি তা সবই সেলাই মেশিন কারখানার। এবারে ফ্যান কারখানার কথা একটু বলি। ধর্মঘটের কয়েক বছর আগে ফ্যান ডিপার্টমেন্টকে বাঁশদ্রোণীতে স্থানান্তরিত করে। সেখানে নতুন করে কাজকর্ম শুরু হয়। ফ্যানের সমস্ত ডিপার্টমেন্টে নতুন করে নিয়োগ ও সম্প্রসারণের কাজ চলতে থাকে। যাদের নাম বারে বারে উঠে এসেছে তাদের মধ্যে সনৎ চক্রবর্তী, অলক হালদার, কার্তিক মন্ডল, সুবলসখা খান, সুনীল দে, বাদল চ্যাটার্জ্জী, রঞ্জিত বোস, সওদাগর রায়, এস. পি. দত্ত, বিমল বসু, মৃত্যুঞ্জয় বসু, বিমল দাস প্রমুখের নাম অবিস্মরণীয়।

প্রথম থেকেই নতুন রক্ত আমদানী হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে এক বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

বেতন incentive সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে ফ্যানের যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলে ইউনিয়নের শক্তি বরাবরই সেলাই মেশিন থেকে ফ্যানের ভূমিকা ছিল নজরকাড়া। এমন কি ধর্মঘট কালীন সংগঠনের মধ্যে তার নজির রয়ে গেছে। অঞ্চলে ইউনিয়নের ক্যাম্প গড়ে তোলা, শ্রমিকের ওপর কোম্পানীর মামলা মোকাবিলা করা, ধর্মঘটে কারখানা পাহারা দেওয়ার কাজে সমগ্র বাঁশদ্রোণী অঞ্চল জুড়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল আমাদের ইউনিয়ন। এব্যাপারে আমার মনে পড়ে কার্তিক মণ্ডলের কথা। পশুপতি ঘোষের নেতৃত্বে যে অংশ কোম্পানীর সব ধরনের কাজের সহযোগিতা করত, তারা শ্রমিকদের মধ্যে পাকাপাকি ভাবে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য অপপ্রচার করতে থাকে। এই সময়ে কার্তিক মন্ডল রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং শ্রমিকদের মধ্যে কোম্পানী যাতে কোন মতেই বিভেদ ডেকে আনতে না পারে, তার জন্য শুধু প্রচার নয়, শ্রমিকদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের এই বিভেদ সৃষ্টির অপকৌশলকে পরাস্ত করার কাজে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

১৯৬০ সাল থেকে জয়া কারখানায় অসন্তোষ বাড়তে থাকে। তার বিস্ফোরন হয় ১৯৬৩ সালে শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে। সারা বাংলায় তখন মালিকদের আক্রমণ বাড়তে বাড়তে এক অসহ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে মালিকরা তাদের যাবতীয় আক্রমণ নিয়ে আসে। প্রতি কারখানায় শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে থাকে। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। জয়াতে একটি মাত্র ইউনিয়ন ছিল, তাতে সব রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করত কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই। ভালভাবেই চলছিল কারখানা। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সভাপতি এবং সুশোভন রায় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত ছিলেন। কোনো বিরোধ ছিল না, সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনীতি নির্বিশেষে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল। AITVC অন্তর্ভুক্ত জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ ভাবেই শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। ১৯৫৮ সালের একটি সাবকি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে শ্রমবিরোধের যাবতীয় বিরোধ নিজেরাই মীমাংসা করে নিত সরকার পক্ষের কোনো সাহায্য ছাড়াই। এমনকি শ্রমিকদের INCENTIVE BONUS এরও মীমাংসা হয়। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে মালিক পক্ষই BONUS কে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে ঐক্য ভাঙার কাজ শুরু করে।

এ প্রসঙ্গে কারখানার অবস্থা আগেই বলেছি, তাতে ঘৃতাহুতি পড়ে কোম্পানীর একটি নির্দেশে, তারা ৫৮ সালের General Agreement কে বাতিল করে দেয়। স্বভাবতই শ্রমিকরা এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। পরে কোম্পানির সাথে আপাতত মীমাংসা করে অবস্থান ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয় এবং শ্রমিকদের আশ্বস্ত করা হয় যে ঘটনা যেদিকে যাচ্ছে তাতে করে ধর্মঘট ছাড়া আর কোনো বিকল্প দেখা যাচ্ছে না, সময়মত শ্রমিকদের সামনে সব কিছু রেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এদিকে কোম্পানী কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। কারখানার ম্যানেজার T. R. Gupta মহাশয় ক্যান্টিনে শ্রমিকদের সাধারণ সভা ডেকে ইউনিয়ন নেতৃত্বকে সরাসরি আক্রমণ করেন এবং তাদের সেই পুরোনো বস্তাপচা বুলি আওড়ে চিনাপন্থী হিসাবে হরিদাস মালাকার, বিমল চ্যাটার্জ্জী, রমেন সেন, সত্য ঘোষ প্রমুখদের চিহ্নিত করেন। এতে অবস্থা আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কয়েকমাস ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে লেগে যায়। ইতিমধ্যে

১০০ জনের strike commettee গঠিত হয় এবং কোম্পানীর এই আক্রমণ রুখে দেওয়ার জন্য শ্রমিকরা ক্রমশ মারমুখী হয়ে ওঠেন।

এমতাবস্থায় ১৭ ডিসেম্বর থেকে কারখানায় ও sales unit এ ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। ধর্মঘট শুরু হতেই সরকার ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করেন ও ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করেন। কারখানার গেট ও আশপাশ অঞ্চলে কড়া পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এবিষয়ে ইউনিয়ন সতর্ক ছিল। তারা আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পেরে শ্রমিকদের আগেই বিভিন্ন ক্যাম্পের মাধ্যমে দৈনিক যোগাযোগের জন্য বলেন। কেউ যাতে কারখানায় এসে বিপদের মধ্যে না পড়ে সেজন্য প্রথম থেকেই ইউনিয়ন সচেষ্ট ছিল। কার্যত কারখানাকে একটা যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত করে মালিক পক্ষের পাশে দাঁড়ায় তদানিন্তন কংগ্রেসের রাজ্য সরকার। কোনমতেই যখন কোন গণ্ডগোল হল না তখন কর্তৃপক্ষ নতুন কৌশল অবলম্বন করে। Asstt General Manager গণ্ডগোল বাধানোর জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা শুরু করে, কারখানা থেকে দূরে সকাল বেলায় শ্রমিকদের যোগাযোগ কেন্দ্র ঢাকুরিয়ার মোড়ে অপেক্ষারত শ্রমিকদের ওপর নানারকম ব্যাঙ্গ, বিদ্রুপ করে তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। কিন্তু নেতৃত্ব সচেতনভাবে ক্যাম্পের সমবেত শ্রমিকদের কাউকে উত্তেজিত না হয়ে চুপচাপ চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তখন সদলবলে গাড়িতে করে রাস্তায় রাস্তায় পুলিশসহ টহল দিয়ে কারখানার শ্রমিক দেখলেই তাকে নিয়ে কারখানার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং ধর্মঘটকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে। এ খবর বিভিন্ন ক্যাম্প মারফত শ্রমিকদের কাছে দ্রুত পৌছে যায় এবং শ্রমিকদের সতর্ক হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কার্যত শ্রমিকদের উত্তেজিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ হতাশ হয়ে পড়ে এবং নতুন করে গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস মালিকদের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। কোম্পানী চেয়েছিল কারখানা অঞ্চলে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে শ্রমিকদের ঘাড়ে দোষ চাপানো এবং ভারত রক্ষা আইন অমান্যকারী হিসাবে চিহ্নিত করা। একাজেও তারা সফল না হয়ে নতুন ষড়যন্ত্র রচনা করে। মালিকপক্ষ শুধু সেলাই মেশিন কারখানা নয়, কারখানার কোয়ার্টার এবং ফ্যান কারখানার কোয়ার্টার ও আশপাশের অঞ্চলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইউনিয়ন থেকে সেলাই মেশিন কারখানা, মসজিদ পাড়া, মোল্লাহাট এলাকা ও ফ্যান কারখানার আশপাশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পাহারাদারির ব্যবস্থা করা হয় এবং মালিক পক্ষের অপচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করার মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে ইউনিয়ন সম্পূর্ণ সফল হয়। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন শ্রমিকে শ্রমিকে হানাহানি করে ঐক্য নষ্ট হচ্ছিল, তখন জয়াতে কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়নি। এরমধ্যে সত্য ঘোষ, হরিদাস মালাকার ও সুশোভন রায় কে পুলিশ ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে ও বিনা বিচারে বন্দী করে। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ হতাশ না হয়ে তাদের অসম্পূর্ণ কাজ সফল করার জন্য নতুন কাজে ব্রতী হয়। সকলেই জানে, আশৈশব শ্রমিক আন্দোলনে ব্যাপৃত থেকে লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করা সম্ভব না হওয়ায় কমরেড হরিদাস মালাকার প্রায়শই তার ক্ষোভের কথা বলতেন। এবারে তিনি জেলের মধ্যে কমরেড চিত্তব্রত মজুমদার এর সাহায্য নিয়ে পরীক্ষায় বসেন ও সাফল্যলাভ করেন। এটাও একটা ভাল খবর। যদিও এজন্য শ্রমিক আন্দোলন কোন সময়ই অসুবিধার মধ্যে পড়েনি তবুও একটা মানসিক দ্বন্দের অবসান ঘটে।

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কর্তৃপক্ষ প্রথমে Industrial Act অনুযায়ী ও পরে ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী ধর্মঘটকে বেআইনি করার পরেও তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিফল হওয়ায় নিত্য-নূতন ফন্দিতে শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। ইউনিয়নও নিজেদের শক্তিকে সংহত করে তাদের ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এসময়ে কর্তৃপক্ষ কারখানার ভেতরে বাঁশের মাচা (Tower) তৈরি করে সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে স্পেশাল পুলিশ আমদানী করে মোতায়েন করে এবং ঘন ঘন পুলিশ টহল দিয়ে শ্রমিকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তাতেও শ্রমিকদের কোন হেলদোল নেই দেখে কোম্পানী রাজ্য সরকারি প্রশাসনকে শ্রমিকদের ওপর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নানা অজুহাতে গণ্ডগোল বাঁধানোর চেষ্টা করে যায়। যখন কিছুতেই শ্রমিকদের উত্তেজিত করা সম্ভব হয় না তখন সরাসরি শ্রমিকদের ওপরে আক্রমণ করা শুরু করে। একদিন বিকেলে উভয় কারখানার গেটে শ্রমিকদের জমায়েতের ওপর পুলিশ হামলা করে ও ১০০ জন শ্রমিককে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে।

এই দলে ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও গ্রেফতার হতে হয়। গত ৩ বছর, প্রথম ৬ মাস বিনা বেতনে এবং বাকী সময়টা মাসিক ২৫ টাকা মেরিট অ্যালাউন্স নিয়ে কাজ করতাম। ১৯৬১ সালে বহু প্রতীক্ষিত স্থায়ী শ্রমিকের স্বীকৃতি সবেমাত্র পেয়েছি। এসময়ে একদিন কমরেড অসিত মুখার্জী, যিনি ট্রেনিং স্কুলের সুপারভাইজার ছিলেন, তাঁর বাড়িতে আমাকে কমরেড বিমল চ্যাটার্জ্জী দেখা করতে বলেন। আগেই আমি বলেছি বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩০টা ক্যাম্প গঠনের কাজ ইউনিয়ন সম্পন্ন করেছিল, এব্যাপারে আমাদের রাসবিহারী ক্যাম্পেও প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দেওয়ার পর আমাকে তিনি সরাসরি ক্যাম্প-ইনচার্জ হবার প্রস্তাব দেন। আমি আমার অসুবিধার কথা বলে তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু বিমলদা-কে কিছুতেই মানাতে পারিনি। প্রসঙ্গক্রমে আমি সেবছর B.A. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বিমলদা-কে বলায় তিনি বলেন যে তিনিও সেবছর B. Com. পরীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবছেন এবং যে কাজ আমরা শুরু করেছি সেই ধর্মঘট সফল করার মধ্যেই আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, ধর্মঘটের পরে আমরা একই সাথে পরীক্ষা দেব। আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হই এবং ক্যাম্প ইনচার্জ হিসাবে কাজ শুরু করি। চারুচন্দ্র কলেজে তখন সান্ধ্যবিভাগে ছাত্র-সাংসদের সাধারণ সম্পাদক আমি আগেই নির্বাচিত হয়েছিলাম, তা কাজে লাগিয়ে অঞ্চলে ছাত্রদের মধ্যে ধর্মঘটের প্রচার করার চেষ্টা করি। তবে অধিকাংশই বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী হওয়ায় এবং অন্যত্র চাকুরি করায় আমি সফল হতে পারিনি।

আমার অতীতে ধর্মঘটের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। শুধু কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুসরণ ও তাকে সফল করার কাজটাই ছিল প্রধান। একাজে আমি অনেকটা সাফল্য পাই। সেদিন ছিল আমাদের রাসবিহারী ক্যাম্পের হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ। বর্তমানে যেখানে কারখানার পাশে পেট্রোল পাম্প সেখানে ছিল জলা জমি। তাকে আমরা পঙ্কজিনীর মাঠ হিসাবে জানতাম। বিকাল বেলা আচমকা প্রচুর পুলিশ মাঠে উপস্থিত শ্রমিকদের গ্রেফতারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে এলাকা ঘিরে ফেলে ও শ্রমিকদের গ্রেফতার করে। আমিও ওই দলের মধ্যে পড়ে যাই। আমার সাছে ছিল সমীর গাঙ্গুলী, সে সাইকেল নিয়ে সামনে আসে ও হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। কিছু শ্রমিক জলা জমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করে। বাকী আমাদের সবাইকে থানায় নিয়ে যায় ও সেখানে গিয়ে আমি দেখি বাঁশদ্রোণী থেকেও একইভাবে কারখানার গেট অঞ্চলে পুলিশ

হামলা করে শ্রমিকদের থানায় আনে যার মধ্যে কমরেড অমর নাগ, সুবল সখা খান, অমর ঘোষ ও অন্যান্য অনেক শ্রমিক পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। পরেরদিন আদালতে আমাদের ভারত রক্ষা আইন বলে গ্রেফতার করা হয় ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠান হয়।

এখানেই আমার সাথে কমরেড বাদল চ্যাটার্জীর পরিচয় হয়। বাদলবাবু ইউনিয়নের তরফ থেকে মামলা তদারকির কাজের দায়িত্বে ছিলেন। দীর্ঘ ২ মাস আমাদের জেলে থাকতে হয়।

জেলে যাবার পরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমরা, আমাদের জেলে থাকার জন্য কিভাবে চলা উচিত তা ঠিক করে এবং জেলের নিয়মানুসারে আমরা যে কাজগুলো করতে হবে তার দায়িত্ব বণ্টন করে নিই। কমরেড অমর নাগকে আমরা আমাদের মুখপাত্র এবং কমরেড সুবলসখা সেনকে ক্যান্টিন দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমাদের বাইরের সাথে যোগাযোগ বা খবরাখবর পেতে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। একমাত্র ভরসা বাদলবাবু বা অন্য কেউ কবে আসবেন তারজন্য মুখ চেয়ে থাকতাম, অবশ্য বাড়ির লোকরা প্রায় নিয়মিত জেলে গেটে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করত।

কিছুদিন যাওয়ার পরে প্রায় রোজই নিত্যনূতন Industrial Prisoner হিসাবে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন কারখানা ও অঞ্চল থেকে কমরেডরা এসে জেল প্রায় ভর্তি করে ফেলেন। তাদের কাছ থেকে জানা যায় বাইরে প্রচণ্ড দমন-পীড়ন চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। শুধু গ্রেফতার নয় এরসাথে যুক্ত হয়েছে মালিকদের আক্রমণও। জেল থেকে বেরোনোর পরে আমরা জানতে পারি প্রায় ১৫০ জন কলকারখানার শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হন এবং প্রায় ১৩০ জন কমরেড ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন। এসবই হয়েছে তদানিন্তন কংগ্রেস সরকারের প্রচেষ্টায়।

একটা ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধাবস্থা তৈরি করা হয়েছিল, তা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যাকে সামনে রেখে সরকারপক্ষ সীমান্ত যুদ্ধে না যেয়ে, দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিক শ্রেণীর উপর সুপরিকল্পিতভাবে মালিকদের ইশারায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই প্রথম একটা কারখানাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সমাবেশ হয়েছিল সারা বাংলায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, ক্লাব, উদ্বাস্তু কলোনি কমিটি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ সমস্ত অঞ্চলের নাগরিকদের মিলিত প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল। এমনকি সুদুর ডায়মন্ড হারবারে পর্যন্ত চাল, পয়সা ইত্যাদি সংগ্রহের কাজে যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা অতীতে কখনও ঘটেনি। রেকর্ড থেকে জানা যায়, প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও চাল, ডাল সংগৃহীত হয়েছিল যা ১৯৬৩ সালের অবস্থায় ভাবা যায় না। এর সাথেই আমাদের ভেবে দেখতে হবে বোনাস, গ্রাচ্যুইটি, সেলস্ কর্মীদের ডিএ ইত্যাদি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দাবীতে সংগঠিত এই ধর্মঘটকে ভেঙে দেওয়ার জন্য মালিকপক্ষের এই প্রচেষ্টা, যাকে সরকারি বদান্যতায় পুষ্ট করা হয়েছিল। শ্রমিকদের একাংশকে বিভ্রান্ত করার জন্য, শ্রমিকদের ঐক্যকে বিনষ্ট করার জন্য নেতৃত্বের একাংশ গোপনে যে কার্যকলাপ করেছিল তাও বিস্ময়ের সাথে আমাদের দেখতে হয়েছে। সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়েও সে দায়িত্ব পালন না করে উল্টে, শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য তথাকথিত শ্রমিক-দরদী সেজেও শ্রমিকদের প্রতি কার্যত বিশ্বাসঘাতকতার সামিল বলে আমার মনে হয়েছে।

কারখানা থেকে মাল বের করে নেওয়ার জন্য পুলিশকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা যাতে জোরদার করা যায় তার জন্য মালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার কোন চেষ্টারই কসুর করেননি। মুখে শ্রমিকদরদী সেজে বাইরে মাল বিক্রি করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এসব কথা বলছে। অথচ দেখা যায় মাল যেখানে পাঠানোর কথা এত জরুরি মনে হচ্ছে সেখানে দীর্ঘদিন পর্যন্ত না পাঠিয়ে মজুত আছে। এসব আরও ছোট, বড় ঘটনা আছে যা আপনাদের বলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না, ইউনিয়ন নেতৃত্বকে সর্বাঙ্গীন আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে যে কুৎসা, অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, তাকে প্রতিহত করার জন্য একটা বিরাট সময় পর্যন্ত লড়তে হয়েছে। আরও অনেক ঘটনা আছে, যা সবটা বলা সম্ভব হবে না বা আমার স্মরণেও আসছে না। তা সত্ত্বেও বলতে হয় একটা শ্রমিকদের আন্দোলন, তাদের দাবী-দাওয়ার জন্য ধর্মঘটকে রাজনৈতিকরূপ দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা সরকারপক্ষ করেছিল তা অত্যন্ত লজ্জার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও আমরা দেখেছি ইউনিয়ন নেতৃত্ব কখনও ধৈর্য্য না হারিয়ে ধর্মঘটের মীমাংসার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

এবারে আসা যাক মীমাংসা আলোচনার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন নেতৃত্ব কি সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে চলছিলেন? এককথায় বলা যায় তা সম্ভব হয়নি। একদিকে কুৎসা ও অপপ্রচার অন্যদিকে শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙার জন্য মালিকদের অপকৌশল। যেটা শ্রমিকদের আন্দোলনের ঐক্য ভাঙারই সামিল। এবিষয়ে ইউনিয়নের সভাপতি কারুর সাথে আলোচনা না করেই দিল্লীতে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তালিকা নিয়ে আসায় শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এব্যাপারে স্ট্রাইক কমিটির সভায় আলোচনা উঠলে দেখা যায় শ্রমিকেরা সবাই উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিতভাবে সভাপতির এই আচরণ নিয়ে নানা প্রশ্ন করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে সম্মিলিত ভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার জন্য তারা কর্তৃপক্ষকে বলেন এবং সেইমতো সিদ্ধান্ত হয়।

এভাবেই নানা উথাল-পাথালের মধ্যে দিয়ে ধর্মঘটের মীমাংসা করতে শ্রমিকদের একটা সময়ে বাধ্য হতে হয়। তাতে শ্রমিকদের মধ্যে অপপ্রচারের কোন লেশমাত্র পড়েনি। এই ধর্মঘট করে শ্রমিকরা কী লাভ করলো? এটা নিয়েও নানা অপপ্রচার করা হয়েছে। একদিকে পুরোনো সাধারণ চুক্তি বাতিল, বোনাস চুক্তি বাতিল, শ্রমিকদের দাবী-দাওয়াকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র দমন-পীড়ন ও অত্যাচারের মাধ্যমে শ্রমিকদের বাধ্য করার কৌশল মালিকদের সফল হয়েছিল। কিন্তু এটা শ্রমিকদের একটুও হতোদ্যম না করে তাদের উৎসাহ সৃষ্টি করতে সফল হয়েছিল। যা পরবর্তী বহু ঘটনা থেকে বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। শ্রমিকরা বুঝতে পেরেছে মালিক শ্রেণীর চরিত্র, সরকারি অপকৌশল ও শ্রমিক বিরোধী ভূমিকা।

এককথায় বলতে গেলে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ও মালিকদের মিলিত চক্রান্তের সাথে শ্রমিকরা পেরে না উঠলেও যে ঐক্য ও চেতনার পরিচয় জয়ার শ্রমিকরা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র শ্রমিকদের উৎসাহিত করেনি, সারা রাজ্যে মালিক শ্রেণীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এরফলে বিরাট এক প্রভাব পড়ে সারা রাজ্যের শ্রমিক আন্দোলনে। বিভিন্ন কলকারখানা ও অফিসে শ্রমিকরা এই ধর্মঘটের সমর্থনে যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তাতে তাদের হতাশা থেকে মুক্তির পথ তারা খুঁজে পেয়েছিলেন, যা ১৫০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেও শ্রমিকদের হতাশ করতে না পারার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত।

# দুখী ঈশ্বর

(২য় পর্ব)

গৌতম রায় চৌধুরী

আমরা ইতিমধ্যেই পারিবারিক জীবনের যে সকল অশান্তি বিদ্যাসাগরকে অসুখী করে তুলেছিল তা যথাসম্ভব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শুধু পারিবারিক জীবন নয়, সামাজিক জীবনেও, শিক্ষা বা সমাজ-সংস্কার, যেদিকেই তিনি এগিয়েছেন, প্রগতিশীল ইংরেজ শাসক বা দেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেইজন্য :—

"বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁর স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।"

'চারিত্রপূজা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৩৯

উপরন্তু, তাঁর দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিরা আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব নির্বিশেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের কুৎসা বা নিন্দা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। একটা ঘটনা শুনলে লজ্জায়, ঘৃণায় মাথা নত হয়ে আসে।

"...ঐ যশস্বী ব্যক্তি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। এই উচ্চপদও বিদ্যাসাগরের প্রসাদেই প্রাপ্ত। তাঁহার অধীনে চাকুরি খালি ছিল। যে লোকটি চাকুরির জন্য ধরিয়াছিল, সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে উচ্চপদস্থ বাবুর নামে এক সুপারিশ চিঠি লইয়া একদিন তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হয়েন। ....বাবু তখন তামাক টানিতে টানিতে একটু হাসিলেন। ইয়ারবর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" বাবু বলিলেন, "ব্যাপার আর কি? বিদ্যাসাগর ব্যবসায় ধরিয়াছে। চাকুরি ক'রে দাও।"

.... এরূপ অকৃতদার বহু প্রমাণই পাওয়া যায়। কেউ নিন্দা করিয়াছেন শুনিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,— 'সে কি রে, আমার নিন্দা? আমি তো তাহার কোন উপকার করি নাই।"

তিনি প্রায়ই বলিতেন,— তিনি যাঁহার যত উপকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকট তত অধিক প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

'বিদ্যাসাগর', বিহারীলাল, পৃ. ২১৭-২১৮

এটাই বিদ্যাসাগরের নিয়তি। এই কুৎসা বা বঞ্চনাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়— আত্মীয় ও অনাত্মীয়। আমরা প্রথমে পারিবারিক ক্ষেত্রটা আলোচনা করব।

উনবিংশ শতকে একান্নবর্তী পরিবারই ছিল মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্তের আদর্শ পারিবারিক ব্যবস্থা। কিন্তু এটা যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ তা, যুগের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন। বাড়ির বধূদের নিরক্ষরতা, ছোট ভাই ঈশান, পুত্র নারায়ণ এবং ভাইপোদের উচ্ছৃঙ্খলতা যে একান্নবর্তী পরিবারের ফলশ্রুতি তা অনুধাবন করতে দূরদর্শী বিদ্যাসাগরের অসুবিধা হয়নি। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারও মেয়েদের 'অন্তঃপুর শিক্ষার" ব্যর্থতার কারণ হিসাবে "পারিবারিক আধিপত্য ও অবিচার-কেই

দায়ী করেছেন। বিদ্যাসাগর এই অব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়ে, ভাই-বোন-ছেলে প্রত্যেকের পৃথক বাড়ি তৈরি করে দিলেন এবং ছেলেসহ সবাইকে পৃথগন্ন করে দিলেন। এর জন্য তিনি আত্মীয়দের বিরাগভাজন হলেন, এমন কি তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুদের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হল।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় একান্নভুক্ত পরিবার প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহা তাঁহার দোষ নহে, দোষ তাঁহার শিক্ষার। হিন্দুধর্মের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না।"

'বিদ্যাসাগর', বিহারীলাল, পৃ. ২৬৯

ভাইরা অধিকাংশই আর্থিক বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। আত্মীয়রাও বেশির ভাগই নিজেদের উন্নতির সোপান হিসাবে তাঁকে ব্যবহার করেছেন। ভালোবাসা তো দূরের কথা, সুযোগ পেলেই কুৎসা রটিয়েছেন। এই বিদূষণের চরম রূপ দেখা যায় দৌহিত্রী সরযূবালার লেখায়। সরযূবালা ছিলেন বিদ্যাসাগরের তৃতীয় কন্যা বিনোদিনীর দ্বিতীয়া কন্যা। বিনোদিনীর সঙ্গে ১৮৭৫ সালে সূর্যকুমার অধিকারীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সূর্যকামুরারের বাবার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল, কারণ বিদ্যাসাগরের মেয়েকে বিয়ে করলে সমাজে একঘরে হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সূর্যকুমারকে খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই তাঁর আগ্রহে ও উদ্যোগে বিয়েটা হয়। বিদ্যাসাগর সূর্যকুমারকে খুব ভালোবাসতেন। বিপথগামী পুত্র নারায়ণের পরিবর্তে সূর্যকুমারকে পুত্রস্নেহে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাই তিনি সূর্যকুমারকে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি ছাড়িয়ে প্রথমে মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন এবং পরে ১৮৮২ সালে তাঁকে মেট্রোপলিটান কলেজ ও স্কুলগুলির সেক্রেটারি করে দেন। এই ঘটনায় সূর্যকুমার অধিকারী মাতাল বলে কুৎসা রটে। বিদ্যাসাগর এটি ও অন্য আর একটি কুৎসা খণ্ডনের জন্য 'অপূর্ব ইতিহাস' (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ, ১৯৯৭) নামে পুস্তিকা রচনা করেন। কিন্তু ১৮৮৮ সালে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগে তাঁকে বরখাস্ত করেন। এরই প্রতিক্রিয়া মনে হয় সূর্যকুমারের মেয়ে সরযূবালার বিষোৎগার। সরযূবালা মাত্র ২১ বছর বয়সে বিধবা হন। ১৯৪৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরের কুৎসায় পূর্ণ একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, যেটি অমিয় কুমার সামন্ত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-র ২০০৫ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করেন। নীচের উদ্ধৃতিগুলি সব সেই লেখা থেকে নেওয়া। [আগ্রহী পাঠকগণ সংবর্তক, জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশিত আশীষ লাহিড়ীর 'ঘর-জ্বালানে বিদ্যাসাগর'—লেখায় বিশদ বিবরণ পাবেন]

"গভর্ণমেন্ট প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ মধ্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি থাকায় তিনি তখন তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব অথচ নিঃস্ব কৃতবিদ্যাদিগকে গভর্ণমেন্টের চাকরিতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কুটুম্ব ও আত্মীয়স্বজনদের যে এরূপ কোনো উপকার করিয়াছেন তাহার একটি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায় না। ....এজন্য আমার মাতামহী (বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দিনময়ী) তাঁহাকে 'ঘর জ্বালানে' 'পর ভোলানে' এরূপ অপূর্ব আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন।"

বাস্তবে বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ আত্মীয় (নিকট বা দূর) তাঁহার সহায়তায় জীবিকার সংস্থান করেছিলেন। এছাড়া বিদ্যাসাগর আমৃত্যু তাঁদের জন্য মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকী তাঁর উইলেও সেই সকল ব্যবস্থা অটুট ছিল।

সরযূবালার আরও অভিযোগ আছে। "তিনি (বিদ্যাসাগর) অনেক সময় গর্হিত, নিন্দিত, ঘৃণিত কর্ম করিয়া

গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কর্তব্যকর্ম অপালন জন্য তাঁহার মহাপাপ হইয়াছে। ........ অকরাণ একটি নিরীহ শরণাগত জীবাত্মার সমূলে উচ্ছেদ সাধন অতি গুরুতর পাপ, মহাপাপ।"

"নিরীহ শরণাগত জীবাত্মার সমূলে উচ্ছেদ" বলতে মনে হয় তিনি নিজের পিতা সূর্যকুমারের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কথাই জানাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ যেটা ছিল বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অন্যতম গুণ— দোষী পুত্র (নারায়ণকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন) বা পুত্রাধিক প্রিয় জামাতাকে ক্ষমা না করা, সেটাই তাঁর নাতনীর কাছে 'মহাপাপ'। অথচ সূর্যকুমার কিন্তু চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরও বিদ্যাসাগরের সঙ্গ ত্যাগ করেন নি, বাদুড়বাগানের বাড়িতেও যাতায়াত বন্ধ করেন নি। এমন কী অসুস্থ বিদ্যাসাগরের সেবাযত্নও করতেন। সম্পর্কছেদ হয় ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর, যখন তিনি সপরিবার মুর্শিদাবাদের পৈতৃক বাড়িতে ফিরে যান।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর দৌহিত্রীর মূল্যায়ণ—

"তিনি দরিদ্রঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও বুদ্ধি, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও ভাগ্যবলে বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হন। এজন্য তাঁহার একটি বিশেষ অহঙ্কার ও আত্মাভিমান জন্মে। তিনি নিজেকে ক্ষণজন্মা পুরুষ মনে করিতেন এবং কখনও কাহারও সহিত মিলেমশে ঐক্যমতে কাজ করিতে পারিতেন না। তাঁহাতে ব্রাহ্মণসুলভ সংযম, তিতিক্ষা ও ক্ষমা লক্ষিত হইত না। তিনি সত্যার্থ পালন করেন নাই এবং প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি ক্রোধাপি ষড়রিপুর প্রবল তাড়নে অনেক সময় অনেক অবৈধ কাজ করিয়া ফেলিতেন। এবং যাহার উপর যখন একবার চটিতেন তাহাকে একেবারে ছারখার না করিয়া ছাড়িতেন না। ইহাতে তাঁহার আপনপর ভেদ থাকিত না। ........ আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি এবং সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি যে, তিনি যে সকল নগণ্য ব্যক্তিদের সাহায্যে ও সহায়তায় তাঁহার সাংসারিক কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেককে একেবারে বিনাশ করিয়া গিয়াছেন। যশঃলিপ্সা ও নিন্দাভয় তাঁহার আর একটি চরিত্রগত বিশেষ ত্রুটি ছিল।"

এই সব দোষারোপ করার পর সরযূবালা কুটুম্বদের প্রতি বিদ্যাসাগরের ঘোরতম অন্যায়ের এক কাহিনী তুলে ধরেছেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন খানাকুল—কৃষ্ণনগরের কুলীন। তাঁর কুটুম্বরা (কুলীন-ভঙ্গকুলীন) কয়েকজন মিলিত ভাবে তাঁকে 'বহুবিবাহ নিবারণ' ও 'বিধবাবিবাহ প্রচলন' থেকে নিবৃত্ত হতে বলেন। বিদ্যাসাগর সম্মত না হওয়াতে তাঁকে সমাজচ্যুত হওয়ার ভয় দেখিয়ে বলেন বিদ্যাসাগরের চার মেয়েকে হয় চিরকুমারী থাকতে হবে নয় মুসলমানকে বিয়ে করতে হবে। উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন যে কুলীন ঘর না হলে তিনি মুসলমানের হাতেই মেয়েদের সম্প্রদান করবেন। কারণ ওই পণ্ডিতবর্গ নকল মুসলমান, তার চেয়ে আসল মুসলমানই ভালো।

"ব্রাহ্মণেরা সক্রোধে পৈতা ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া গেলেন; বলিলেন— 'তুমি নিপাত যাও, তোমার বংশ নিপাত যাউক। অভিসম্পাতের ফল কালে ফলিবেই ফলিবে।"

আশ্চর্য! পিতৃদর্শনে কাশীতে গিয়ে সেখানকার অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণদের বিদ্যাসাগর অবজ্ঞা করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

"যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।"

"চারিত্রপূজা", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৩৮

আর বিদ্যাসাগরের নাতনী কুলীন ব্রাহ্মণদের তথাকথিত অপমানের ঘটনাটাকে তাঁর চরিত্রের হীনতা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগর আজও প্রাতঃস্মরণীয় তার সমর্থনে কুলীন পণ্ডিতদের (?) মুখের উপর কথা বলা নাকি বিদ্যাসাগরের অন্যায় হয়েছিল। দৌহিত্রীর কুৎসার মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের মহত্বই প্রমাণিত হল। বহু তথাকথিত প্রগতিশীল মহাপুরুষের ন্যায় তিনি একদিকে আদর্শ ও মূল্যবোধের কথা বলে অন্যদিকে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি। যৌবনে 'কুপথগামী' নারায়ণকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। আবার শেষ বয়সে, শরীর-মন যখন অবসন্ন, তখনও পুত্রতুল্য জামাইকে তহবিল তছরূপের অভিযোগে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। কিন্তু নাতনী তথা পরিবারের কুৎসার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

বিদ্যাসাগরের নিজের ভাষায় ঃ—

"বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজম্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।"

[ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি]

'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত', শম্ভুচন্দ্র, পৃ. ১২৪

এই সৎকর্ম সম্পাদনে, হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অচলায়তন ভাঙতে গিয়ে তাঁকে যে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা বহুল চর্চিত। যুক্তি সঙ্গত বাধা ছাড়াও তাঁকে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে, কুৎসার আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল।

"সমস্ত ভারতবর্ষে এ বিষয়ের (বিধবা বিবাহ) আন্দোলন চলতে থাকিল; বঙ্গদেশের অনেকেই নানা প্রকার কুৎসা ও গালি দিতে লাগিল। এই সময়ে পিতৃদেব, কলিকাতায় বহুবাজারস্থ পঞ্চাননতলার বাসায় একদিন ডাক্তার নবীণচন্দ্র মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাস্যবদনে বলিলেন, 'ঈশ্বর! আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না।"

'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত', শম্ভুচন্দ্র, পৃ. ৬২

সবাই জানি যে, সেই সময় সমাজের অধিকাংশ লোক রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। স্বভাবতই তৎকালীন সুশীল সমাজ বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে ছিল। শুধু গোঁড়া হিন্দুরা নন, অনেক সাধারণ মানুষও ওই কাজের বিপক্ষে ছিলেন। রাস্তায় বিদ্যাসাগরকে একদল লোক চারদিক থেকে ঘিরে গালাগাল করত, ঠাট্টা করত, কেউ আবার মেরে ফেলবারও ভয় দেখাত। তাই বীরসিংহ থেকে ঠাকুরদাস, শ্রীমন্ত নামে এক জেলে-সর্দারকে বিদ্যাসাগরের দেহরক্ষী করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সপক্ষে যেমন প্রচুর গান-কবিতা রচিত হয়েছিল, বিপক্ষে কুৎসাও কম ছিল না। সেই রকম একটা গানের প্রথম লাইনটা ছিল, "শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।' প্রভাকর-সম্পাদকের রচিত কবিতাটির কয়েকটি লাইন;—

"কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঢ়ী।
তাহারা সধবা হবে,, প'রে শাঁকা শাড়ী॥
এ বড় হাসির কথা, শুনলে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥

"বিদ্যাসাগর", বিহারীলাল, পৃ. ১৯৫

সেকালের অন্যতম কবি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সুযোগ পেলেই বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করে কবিতা রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরকে সামাজিক ভাবে বয়কট করে একঘরে করা হয়েছিল। বহু বছর বাদেও, ১৮৭৫ সালে একঘরে হওয়ার ভয়ে, সূর্যকুমার অধিকারীর বাবা বিদ্যাসাগরের মেয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে ছেলের বিবাহে রাজি ছিলেন না। এরও আগে ১৮৬৯ সালে,

> "বীরসিংহে গ্রাম পরিত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহারই (বিদ্যাসাগর) অন্নে প্রতিপালিত কোন অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয় একস্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,— "জানেন, তাঁর ধোপা-নাপিত বন্ধ করিয়া দিতে পারি; তাঁকে এখানে চেনে কে?"

"বিদ্যাসাগর", বিহারীলাল, পৃ. ২৯৩

সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। কট্টর হিন্দুত্ববাদী বঙ্কিম তাঁর সৃষ্টি চরিত্রের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরকে 'মূর্খ' বলে বিদ্রুপ করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২)-তে নায়িকা সূর্যমুখী কমলমণিকে একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ

> "আর একটা হাসির কথা, 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর গ্রামে কলকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বই বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

বঙ্কিম রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, পৃ. ২২০

ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বা বহু বিবাহ প্রথার প্রভৃতি সামাজিক প্রচেষ্টাকে সর্বদা বিদ্রুপ করেছেন তা নয়, তিনি বিদ্যাসাগরকে সাহিত্যিকের মর্যাদাই দিতে চান নি। তিনি বিদ্যাসাগরের রচনাগুলিকে অন্য ভাষা থেকে চুরি বলে উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমের মতো অনেকেই তাঁকে কেবল পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা ও অনুবাদক বলে মনে করেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন—

> "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সর্বপ্রথমে বাংলা-গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।"

চারিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৩

একথা সত্য যে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অনুবাদে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়েছে। কিন্তু গত শতাধিক বর্ষে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়কে' অতিক্রম করার মতো কোনো পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় রচিত হয় নি। যে বইয়ের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান নিবেদন করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন— 'সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটাই আদি কবির প্রথম কবিতা।"— সেই বর্ণপরিচয়কে বাঙ্গালির আর এক শ্রেষ্ঠ মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্রুপ করেছেন। একদিন বিবেকানন্দ দুঃখ করে বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথকে বললেন—

> "দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর রে। ছোট ছেলেদের পড়বার জন্য উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।
> প্রিয়নাথ বললেন— বিদ্যাসাগর মশায়ের তো অনেকগুলি বই আছে।
> স্বামী বিবেকানন্দ উঁচু গলায় হেসে উঠলেন। বললেন— 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'— ওতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না'।"

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ২০১২, পৃ. ১৪৬

কী ভয়ঙ্কর অভিযোগ— 'বর্ণপরিচয়' পড়লে ছেলেরা খারাপ হয়ে যাবে। সমালোচনায় দুঃখ নেই, কিন্তু বারে বারে বিদ্যাসাগর, ধর্মীয় বা পশ্চাদগামী চিন্তার কারণে, কুৎসার শিকার হয়েছেন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যাচারের শিকার হয়েছেন। কুৎসার কদর্য রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নিয়ে। এটা ছাপা হওয়ার আগে বিদ্যাসাগর দুই পণ্ডিত বন্ধু, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে শুনিয়েছিলেন। স্বভাবতই দুজনে কিছু মন্তব্য করেছেন, বিদ্যাসাগর কিছু শব্দের দল-বদল করেছেন। ইতিমধ্যে বইটি বহুল প্রশংসিত হয়েছে, নয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মদনমোহনের মৃত্যুর বহুকাল পরে, জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মদনমোহনের একটি ছোট জীবনী লেখেন। এই বইতে যোগেন্দ্রনাথ অভিযোগ করেন যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের যৌথ রচনা এবং বিদ্যাসাগর অন্যায় ভাবে নিজের নামে এই গ্রন্থ প্রচার করেছেন। স্বভাবতই বিদ্যাসাগর আর এক বন্ধু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি প্রতিবাদ করেন। বিদ্যাসাগর পরবর্তী দশম সংস্করণে দুটি চিঠি প্রকাশ করে দিলেন। তাতে যোগেন্দ্রনাথের মুখ বন্ধ হল, কিন্তু কুৎসাকারীদের মুখ বন্ধ হল না। যোগেন্দ্রনাথের আরও একটি কুকীর্তি আছে। কিছুদিন পরে যোগেন্দ্রনাথ আবার দাবী করলেন যে "শিশুশিক্ষা"র গ্রন্থস্বত্বের অংশ মদনমোহনের মেজমেয়ে কুন্দমালার প্রাপ্য। এমন কী তিনি উকিলের চিঠিও দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিকট মদনমোহনের লিখিত চিঠি পড়ে প্রকৃত সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে চুপ করে গেলেন। কিন্তু কুৎসার এমনই গুণ যে ঘটনার বহুকাল পরেও অনেকেই ওই রটনার উপরে নির্ভর করে তাঁর নামে কুৎসা করে গেছেন। অথচ এই যোগেন্দ্রনাথ প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন এবং বিদ্যাসাগর সেই বিবাহের সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব বহন করেছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর যোগেন্দ্রনাথ মদনমোহনের ছোট মেয়েকে বিয়ে করেন। যে কুন্দমালার জন্য যোগেন্দ্রনাথ দরবার করেছিলেন, তাঁকে বিদ্যাসাগর বহু আগে থেকেই মাসিক দশ টাকা বৃত্তি দিয়ে আসছিলেন, যা এই ঘটনার পরও তিনি বন্ধ করেন নি। কিন্তু মানুষের মুখ তো বন্ধ করা যায় না। তাই ঘটনার সতেরো বছর পর, ১৮৮৮ সালে এপ্রিলে, বিদ্যাসাগর, অনেক কুণ্ঠার সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের কুৎসার জবাবে সত্য ঘটনা বিবৃত করে, 'নিষ্কৃতি লাভে প্রয়াস' পুস্তিকাটি প্রকাশ করলেন। বইটির বিজ্ঞাপনে লিখলেন—

> "......যে মহোদয়েরা, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, আমি পরস্বহারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, অনুগ্রহ পূর্বক, কিঞ্চিত ক্লশ স্বীকার করিয়া, এই পুস্তকে একবার দৃষ্টি সঞ্চারণ করেন; তাহা হইলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, উচিতানুচিত বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া আমার উপর যে উৎকট দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা, কোনও মতে, সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।"

"করুণাসাগর বিদ্যাসাগর", ইন্দ্র মিত্র, পৃ. ৫৪৮

১৮৬৮ সালে, যখন বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের জন্য ঋণভারে জর্জরিত এবং বইয়ের ব্যবসাতেও আশানুরূপ লাভ হচ্ছিল না, তখন কর্মচারীদের উপর বিরক্ত হয়ে, বিদ্যাসাগর কৃষ্ণনগরের বন্ধু ব্রজনাথকে বিণামূল্যে 'সংস্কৃত বুক ডিপজিটরী' দান করেন। আমরা দেখেছি, এই দান নিয়ে, ভাই দীনবন্ধুর সঙ্গে চরম অশান্তি হয়। ১৮৭০ সালে পুত্র নারায়ণের বিধবা-বিবাহের আসরে বিদ্যাসাগর খবর পেলেন যে ব্রজনাথ

কৃষ্ণনগরে মরণাপন্ন। তৎক্ষণাৎ ছেলের বিয়ের আসর ছেড়ে তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে নিয়ে কৃষ্ণনগর গেলেন এবং বন্ধুকে সুস্থ করে ফিরলেন। এই কৃতজ্ঞতার প্রতিদান ব্রজনাথ কুৎসা রটনার মাধ্যমে দিলেন। কারণ, ব্রজনাথের পুত্রের এক বন্ধুকে তিনি অযোগ্যতার কারণে কলেজ শিক্ষকের পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। তাই রটনা করা হল যে কলেজ-সুপারিন্টেডেন্ট, বিদ্যাসাগরের জামাই, সূর্যকুমার মাতাল। তাছাড়া বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত বুক ডিপজিটরী' বজ্রনাথকে দান করে ব্রজনাথের কোনো উপকার করেন নি। কারণ ব্রজনাথ পুত্রসহ ওই দায়িত্ব না নিলে বিদ্যাসাগর খেতে পেতেন না। ১৮৮৪ সালে সূর্যকুমারকে মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেডেন্ট করার জন্য অনেক প্রবীণ অধ্যাপকই ক্ষুব্ধ ছিলেন। ফলে ব্রজনাথের নিন্দাবাদ ও রটনা হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে, ১৮৮৫ সালে, সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বিদ্যাসাগর "অপূর্ব ইতিহাস" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু সব নিন্দা ও কুৎসার জবাব কী দেওয়া সম্ভব।

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আর একটি অপপ্রচার এখনও প্রচলিত আছে। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রকাশিত বই নিজের প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষাবিভাগে অনুমোদন করিয়ে নিতেন। এই সকল অভিযোগের কোনো তথ্যনিষ্ঠ প্রমাণ নেই। [আগ্রহী পাঠকরা অমিয় কুমার সামন্ত রচিত 'বিদ্যাসাগর'-বইয়ে (পৃ. ১৩৫ থেকে পৃ. ১৪১) বিশদ বিবরণ পাবেন।]। তৎকালে আরও অভিযোগ ছিল যে তাঁর চক্রান্তে অন্য লেখকের বই সরকারি বিদ্যালয়ে অনাদৃত। ১৮৫৪-এর ২২ জুলাই 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত একটি চিঠির অংশ বিশেষ—

> "বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয় গভর্ণমেন্টের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন এহেতু মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করেনে না একথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে। তিনি ব্যতীত সংসারে বিদ্বান কেহ নাই ইহাই জ্ঞান করিয়া থাকেন ইহা অত্যাশ্চর্য্য বলিতে হইলেও অতএব আমি তাহাকে জানাই সাগর থাকিলেই মহাসাগর থাকে ইহা যেন তিনি স্মরণ করিয়া রাখেন, ....পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত আরোবীয়োপাখ্যান ও সেক্সপিয়র এই উভয় গ্রন্থ উত্তম হইলেও কেবল বিদ্যাসাগরের চক্রান্তে তাহা যদিও সরকারি বিদ্যালয়ে আদরণীয় হলি না তথাপি তাহা পড়িয়া থাকিল না সকল বিদ্বান সমাজে সমাদৃত হইয়াছে...."

"করুণাসাগর বিদ্যাসাগর", ইন্দ্র মিত্র, পৃ. ২৩৭-২৩৮

অথচ বিদ্যাসাগর, সরকারি চাকরি থেকে ১৮৫৮ সালে পদত্যাগ করার অনেক পরে (১৮৭৩), ইংরাজি ও বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন ও অনুমোদনের জন্য সরকারি কমিটিতে যোগদানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা W. S. Atkinson-এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার কারণ বিদাসাগরের মতে যেহেতু তাঁর রচিত কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক আছে তাই স্বার্থের সংঘাত হতে পারে। সর্বোপরি, তাঁর বইয়ের গুণাগুণ আলোচনার সময় বিদ্যাসাগরের উপস্থিতি অন্য সদস্যদের প্রভাবিত করতে পারে। বর্তমানে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ডে স্বার্থের সংঘাত বন্ধ করতে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায় আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়, আর বিদ্যাসাগর প্রায় সার্ধশতবর্ষ আগে ব্যবসার থেকে সততা ও ন্যায়নীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। তবু কুৎসার মুখ বন্ধ করতে পারেন নি।

তাঁর চেহারা এবং দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য অনেকেই তাঁকে 'উড়ে' বলে অবজ্ঞা করতেন। বিদ্যাসাগর প্রায়শই এই নিয়ে পরিচিতজনদের সাথে রসিকতা করতেন, নিজের পোষাক নিয়ে তিনি আত্মসচেতন ছিলেন। প্রচলিত রীতির বিরোধিতা করে দেশীয় পোষাকেই উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান, আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতেন। বিশেষত, ''চটি জুতা'' নিয়ে তার খুব গর্ব ছিল।

> ''তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন,— 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পাখানা তুলিয়া টক্ করিয়া লাথি মারিতে না পারি।''
>
> 'প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১১

দুঃখের কথা, এই 'চটিজুতা'র জন্যই ভারতীয় যাদুঘরে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৮৭৪ সালে, হিন্দি কবি হরিশচন্দ্রকে নিয়ে তিনি কলকাতার যাদুঘরে যান। তখন যাদুঘর ও এশিয়াটিক সোসাইটি পার্কস্ট্রিটে একই বাড়িতে ছিল। সোসাইটির দারোয়ান তাঁর সঙ্গীদের যাইতে দিলেও ''বিদ্যাসাগরের মতন এক উড়িয়াকে'' জুতা খুলে রাখতে বলল। স্বভাবতই বিদ্যাসাগর যাদুঘরে ঢুকলেন না এবং যাদুঘর কর্তৃপক্ষকে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে, কারণ জানতে চাইলেন। যাদুঘর, সোসাইটি এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে বহু চিঠির আদানপ্রদান হল, কিন্তু—

> ''...বিদ্যাসাগর মহাশয় ফিরিয়া গিয়াছেন বলিয়া কিন্তু তাহার জন্য একটু দুঃখ প্রকাশও করা হইল না, দ্বারবানকে দোষী করাও হইল না; আর ভবিষ্যতে তাহাকে এরূপ করিতে বারণ করা হইবে, তাহাও বলা হইল না।''
>
> ''বিদ্যাসাগর'', বিহারীলাল, পৃ. ৩২৩

সন ১৯৭২— উগ্র বামপন্থীদের দ্বারা বিদ্যাসাগর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ফলে কলেজ স্কোয়ারে তাঁর মুণ্ড ছেদন হল। অপরাধ? তিনি সাম্রাজ্যবাদের দালাল। ঘটনার সূত্রপাত বেশ কয়েক দশক আগে। ১৮৫৬-এর ২৬ জুলাই বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হল। ১৮৫৭-এ সিপাহী বিদ্রোহ। অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন যে সিপাহী বিদ্রোহের এক পরোক্ষ কারণ বিধবা-বিবাহ। কারণ তখন বাংলাদেশে গুজব ছড়িয়েছিল যে বিধবা বিবাহ আইন বলবৎ করে ইংরেজ সরকার হিন্দুদের ধর্মনাশ করছেন। সেই সময়, সামরিক বাহিনীর নির্দেশে বিদ্যাসাগর অসময়ে সংস্কৃত কলেজে পূজার ছুটি ঘোষণা করে দেন এবং সৈন্যদের থাকার জন্য কলেজের বাড়ি ফাঁকা করে দেন। সরকারি নির্দেশে কলেজ বাড়িটি সৈন্যদের জন্য খালি করা ছাড়া সরকারি কর্মচারী বিদ্যাসাগরের গত্যন্তর ছিল না। তাছাড়া সিপাহী বিদ্রোহ শুরুর কয়েক মাসের মধ্যেই গভর্ণর জেনারেল ঘোষণা করেন যে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের জাতধর্ম নষ্ট করছে বলে যে প্রচার করা হচ্ছে তা সর্বৈব মিথ্যা। বিদ্যাসাগর কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষে-বিপক্ষে একটি কথাও বলেন নি। যদিও সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথীপত্র পুরোপুরি দেখার সুযোগ এখনও মেলেনি, তবুও যেটুকু গবেষণা হয়েছে তাতে প্রমাণিত যে সিপাহী বিদ্রোহকে দমন করার জন্য সরকারি ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের নিজস্ব ভূমিকা খুব সামান্যই ছিল। তাই 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল'—এই ভ্রান্ত ধারনা অপনোদন হওয়া উচিত।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও তাঁর স্নেহভাজন হয়েও বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি অন্যায় অভিযোগ করেছেন। তার অন্যতম—

> "আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও অনেক সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীর 'সাহেবদের' কাছে তাঁহার চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি হয়। ....তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্বল্য ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।"
>
> "করুণাসাগর বিদ্যাসাগর", ইন্দ্র মিত্র, পৃ. ২১৪

এই গুরুতর অভিযোগের সপক্ষে কৃষ্ণকমল কিন্তু কোনো প্রমাণ দাখিল করেননি। উপরন্তু এর বিপরীত সাক্ষ্যই আমরা পাই। তবুও, আজও অনেকেই এই অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করেন।

তেমনি নিজ পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগ নেননি বলে বর্তমানের অনেকেই বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করেন। একথা সত্য যে পরিবারের বধূরা সবাই নিরক্ষর ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর এই ব্যাপারে পিতা ঠাকুরদাসের মতকে অগ্রাহ্য না করে হয়তো অন্যায় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চার কন্যাকেই নিজ তত্ত্বাবধানেই বিদ্যালয়ে পড়িয়েছিলেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই তৎকালীন প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেছিলেন। এমন কী দু'জন কলকাতাতে পড়াশুনা করেছিলেন।

অনেকের কাছেই বিদ্যাসাগর ঈশ্বরসম। তবু তাঁর কুৎসাকারীর সংখ্যা আজও কম নয়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'লাগসই' কবিতাটি দিয়ে শেষ করছি:—

"প্রতিদানে ঢিল
ছুঁড়েছে সে সজোরে পাঁজরে
মুখটা ব্যথায় নীল
অতএব লেগেছিল ঠিক
যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না ঈশ্বর বাস্তবিক।"

তথ্যঋণ :

(১) চারিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৫
(২) বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৮৬
(৩) বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরস, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চিরায়ত, ২০১৯
(৪) বঙ্কিম রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৫
(৫) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্র মিত্র, আনন্দ, ২০১৯
(৬) 'ঘর-জ্বালানে' বিদ্যাসাগর, আশীষ লাহিড়ী, সংবর্তক পত্রিকা, জানুয়ারি, ২০২০

# আমাদের সকলের প্রিয়

প্রয়াণ ২১ নভেম্বর ২০১৮

# নীলিমা ধর

## স্মরণে পরিবারের সদস্যবর্গ


- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৮ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

**বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন**

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৮টা)

**কম খরচে**

**রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা**

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

**স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক**

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা

১) ডঃ বিপ্লব আচার্য - এম.এস. (অর্থোপেডিক) সোম ও শুক্র সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর - এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বুধবার ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - সোমবার সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।


Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in